Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-X, Issue-II, January2022, Page No.33-38
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

বাঁকুড়া জেলার কুম্ভকার সম্প্রদায়ের চাকা পূজো: সাস্কৃতিক সম্পর্কের উৎস সন্ধান

ড. শ্রীমন্ত মহাদানী
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, ইতিহাস বিভাগ, পাঁচমুড়া মহাবিদ্যালয়, পাঁচমুড়া, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ

Abstract

The main purpose of this paper is to analyze the importance of 'Chaka puja'(wheel worship) as one of the most important aspects of cultural life. In fact, the source of cultural life lies in the socio-economic structure of the nation. Again, the influence of economy is the greatest among the various elements of cultural life. Economic activities reveal various social customs, rituals, religions, etc., which reveal different aspects of cultural life. In this context, I have tried to shed light on different aspects of Chaka Pujo of the Kumbhakar community of Panchmura village of Taldangra police station in Bankura district. Chaka Puja is the main festival of the potters here. I have tried to analyze the impact of this worship on culture in life. But potters in other parts of the district are deviating greatly from their profession. This is affecting their cultural life. In fact, the impact of economics on cultural life cannot be denied.

Key words: wheel, Worship, culture, religion, economy.

ভুমিকা: সংস্কৃতি (বা **কৃষ্টি**) হল সামাজিক আচরণ ও নিয়ম কানুনের সমষ্টিগত বহিঃপ্রকাশ। একটি দেশ বা একটি জাতির আত্মপরিচয় তার লোক সংস্কৃতি। সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান গুলির পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করার চেষ্টা করেছেন অনেকেই ।তবে সাংস্কৃতিক জীবনকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করে অর্থনীতি। সম্পদ সংগ্রহ ও উৎপাদনের উদ্দেশ্যে মানুষের মধ্য গড়ে ওঠে বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ।এর থেকেই গড়ে ওঠে নানা বিশ্বাস,সংস্কার, রীতি নীতি ও আচার অনুষ্ঠান। এগুলোর মধ্যেই ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় ।সাংস্কৃতিক জীবনের অন্য একটি দিক হোল ধর্ম ।আসলে, যে কোন জাতি বা গোষ্ঠীর মানুষের ধর্ম ও সাংস্কৃতিক জীবনকে অনেকাংশে প্রভাবিত করে তাদের অর্থনৈতিক কাঠামো। স্বাভাবিক ভাবেই কুম্ভকার সম্প্রদায় মানুষের জীবনের সঙ্গে চাকার নিবিড় সম্প্রর্ক গড়ে উঠেছে। এই চাকাকে কেন্দ্র করেই তাদের সাংস্কৃতিক জীবনের বিভিন্ন রূপ প্রকাশ পেয়েছে। সংস্কৃতি শব্দের আধুনিক অর্থ হোল একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীর সামাজিক উত্তরাধিকার ।সংস্কৃতি একটি জাতির জীবনধারা ।আভিধান গত অর্থে সংস্কৃতি শব্দটির অর্থ চিৎপ্রকর্ষ বা মানবীয় বৈশিষ্ট্যের উৎকর্ষ সাধন। Culture (ইংরেজি শব্দ)- এর প্রতিশব্দ হিসেবে বাংলায় **সংস্কৃতি** শব্দটির প্রথম ব্যবহার করা শুরু হইয়েছে ১৯২২ সালে ।[1]

আলোচনার কেন্দ্র: আমার আলোচনার কেন্দ্র বাঁকুড়া জেলা। ভৌগলিক দিক দিয়ে বাঁকুড়া জেলা বর্তমান দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত ।বাঁকুড়া জেলা প্রাচীন রাঢ় অঞ্চলের অংশ বিশেষ ।কোম্পানি শাসনের আমলে প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসাবে বাঁকুড়া জেলার বিকাশ ঘটেছিল ।বাঁকুড়া জেলার সংস্কৃতির বস্তুভিত্তি গঠনে ভৌগলিক প্রভাব অনস্বীকার্য ।[2] জেলার গ্রামীন অর্থনীতির বুনিয়াদ আনেকাংশে দাঁড়িয়ে আছে বিভিন্ন হস্তশিল্পের উপর ।আসলে, হস্তশিল্পই অঞ্চলটিকে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উভয় দিক থেকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। জেলার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে রয়েছে কুম্ভকার সম্প্রদায়ের মানুষরা ।জেলার প্রায় প্রতিটি ব্লকেই মৃৎ শিল্পের কাজ হয়।বাঁকুড়া, সোনামুখী,ওন্দা, ইন্দাস ,পাত্রসায়ের, রামপুর, বেলিয়াতোড়, রাজগ্রাম, কেঞ্জাকুড়া, মালিয়াড়া ,কদমাঘটি ,ছাতনা ,বিবড়দা ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানে এই মাটির কাজ হয় । অর্থাৎ , জেলার বিভিন্ন স্থানে টেরাকোটার কাজের ঐতিহ্য অনেক প্রাচীন ।কিন্তু টেরাকোটা শিল্পের জন্য পাঁচমুড়া বিশ্ব বিখ্যাত হয়ে উঠেছে। পাঁচমুড়া, বাঁকুড়া জেলার তালডাংরা থানার অন্তর্ভুক্ত একটি সমৃদ্ধ গ্রাম। গ্রামটি 'টেরাকোটা গ্রাম' নামেও বেশ পরিচিত।এখানের কুম্ভকার (কুমোর) দের সৃষ্টিশীলতার জন্যই পাঁচমুড়া এই খ্যাতি লাভ করেছে। এমনকি ভারতের বাইরেও বিভিন্ন দেশে পৌঁছে গেছে এই শিল্প কর্ম ।

সাহিত্য পর্যালোচনা: জেলার পোড়ামাটির কাজের পূর্ণাঙ্গ তিহাস তেমন ভাবে লেখা হয় নি । তবে বিভিন্ন পত্রপত্রিকাতে অনেক আলোচনা রয়েছে ।যদিও বেশিরভাগ আলোচনাতে গুরুত্ব পেয়েছে পোঁড়ামাটির শিল্প কর্ম ও তার বিষয় বৈচিত্র । তবে,কুম্ভকার সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা তেমন ভাবে হয় নি । জেলার কিছু লেখক এই বিষয়ে আঞ্চলিক স্তরে আলোচনা করেছেন। অচিন্ত কুমার জানা[3] লোকশিল্পের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে এখানের মৃৎ শিল্পের কথা বলেছেন।পশ্চিমবঙ্গের জনগণনা দপ্তর 'পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা '[4] নামে পাঁচটি খণ্ডে সুবৃহৎ যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন ।তবে এই গ্রন্থে চাকা পূজা নিয়ে তেমন কোন আলোচনা নেই।'মুখের কথায় ইতিহসা''-এই ঘরানার ইতিহাস চর্চা এখন গুরুত্ব পেয়েছে ।তাই চাকা পূজার আলোচনা প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে ।

বর্তমান আলোচনার উদ্দেশ্য: আমি আমার এই প্রবন্ধে কুম্ভকার সংস্কৃতির সাথে চাকার নিবিড় সম্পর্কটিকে অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছি । আসলে, চাকাকে কেন্দ্র করে সে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে তার উৎস নিহিত আছে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে । জীবন জীবিকার উপকরণ গুলোকে দেবতা মেনে পূজো করার রীতি সৃষ্টির প্রথম লগ্ন থেকেই চলে আসছে ।স্বাভাবিক ভাবেই, কুম্ভকার সম্প্রদায়ের _মানুষ চাকা কে দেবতা হিসাবে পূজো করতে শুরু করেছিল ।এই ঐতিহ্য এখনও বহমান।কিন্তু এই সংস্কৃতিকে পাঁচমুড়ার কুম্ভকাররা যেভাবে ধরে রেখেছে তা জেলার অন্যান্য স্থানের কুম্ভকারেরা পারেন নি। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ঔঠে পাঁচমুড়ার এই শিল্পকর্মের বিশেষত্ব কি? কেন তাদের জীবনের প্রধান উৎসব চাকা পূজা?

বিষয় পর্যালোচনা

চাকা জীবিকার হাতিয়ার

চাকা: একপ্রকারের বৃত্তাকার যন্ত্রাংশ। চাকার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত অক্ষ বরাবর এটি ঘুরতে পারে। মানবসভ্যতার ইতিহাসে চাকার আবিষ্কারকে একটি যুগান্তকারী ঘটনা হিসাবে ধরা হয়।একটু অন্যভাবে বললে চাকাকে বলা যায় সভ্যতার গতি।আন্যদিকে ,চাকার প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন মানুষ জীবনধারণের প্রাথমিক রসদ গুলো সংগ্রহ করে আসছে । চাকার কাজকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল কর্ম ভিত্তিক সমাজ ও সামাজিক রীতি নীতি। তবে চাকার সাথে কুম্ভকার সম্প্রদায়ের সম্পর্ক যেমন অনেক প্রাচীন,

অনেক গভীর তেমনি আত্মিকও বটে । এই চাকা কুম্ভকার সম্প্রদায়ের মানুষের জীবন জীবিকার প্রধাণ হাতিয়ার। ইতিহাসের তথ্যের ভিত্তিতে মনে করা হয় নব্যপ্রস্তর যুগের মানুষ মাটির তৈরি জিনিসপত্র আগুনে পোড়ানোর কৌশল আবিস্কার করেছিল। ৪৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের পর মেহেরগড় সভ্যতায় কুমোরের চাকার প্রচলন ঘটেছিল ।[5] কুমোরের চাকা ঘুরিয়ে তৈরি হয়েছিল নানা মৃৎপাত্র। মিশরের নীল নদের উপত্যকাতে গড়ে ওঠা প্রাচীন সভ্যতাতেও কুমোরের চাকার অস্তিত্ব ছিল। হরপ্পা সভ্যতার মৃৎশিল্পীরা বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছিলেন ।[6] অর্থাৎ প্রাচীন কাল থেকেই আর্থ -সামাজিক জীবনে মৃৎশিল্পের গৌরবময় অতীত ঐতিহ্য রয়েছে । স্বাভাবিক ভাবেই চাকা পূজোর মধ্যেই প্রকাশ পায় তাদের জীবন দর্শন ও ধর্ম ভাবনার নানা দিক । চাকা পূজোর মাধ্যমে তারা যেমন তাদের জীবিকা অর্জনের হাতিয়ার গুলোকে দেবতা মেনে পূজো করে ,একই সাথে তারা আগামী দিনের কর্ম জীবনের উন্নতি কামনা করেন। এই চাকার গতির সাথে তাদের জীবনের গতি তথা অর্থনৈতিক অগ্রগতির বিষয়ট জড়িয়ে আছে। এই দিন আগামী দিনের জন্য মাটি সংগ্রহের কাজ শুরু হয় ।এই মাটি তাদের জীবনের মূল রসদ ।

টেরাকোটা: লাতিন শব্দ"টেরাকোটা"র অর্থ বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায় 'টেরা'অর্থাৎ মাটি আর 'কোটা এর অর্থ হল পোড়ানো। তবে, বাংলা সংসদ অভিধান অনুযায়ী টেরাকোটা শব্দটির অর্থ হল "নকশা যুক্ত পোড়া মাটির ফলক। মূলত সাংসরিক কাজে ব্যবহারের জন্য মূলত **টেরাকোটা** তৈরি করা হয়। গৃহের অলঙ্করণ করা বা কোনো শৈল্পিক প্রদর্শনের জন্য **টেরাকোটা** তৈরি করা হয়। এই সুন্দর শিল্পকর্মগুলি মূলত **জেলার** বিষ্ণুপুর এবং পাঁচমুড়ায় তৈরি হয়। **টেরাকোটা** বা পোড়ামাটির **শিল্প** আদিম মানব সভ্যতার **শিল্পের** প্রতীক। মানবসভ্যতার বিকাশকাল হতে পোড়ামাটির ভাস্কর্যের ব্যবহার দেখা হয়। আঠালো মাটির সঙ্গে, তুষ, খড়কুটো প্রভৃতি মিশিয়ে কাদামাটি প্রস্তুত করা হয়। সেই মাটিকে বিভিন্ন আকার দিয়ে তার উপর নানা ধরনের নকশা করে রোদে শুকিয়ে আগুনে পুড়ালেই তৈরি হয় **টেরাকোটা শিল্প**। পোড়া মাটির ব্যবহার ভারতীয় কারু শিল্পে এক প্রাচীন নিদর্শন এবং বঙ্গ সংস্কৃতির এক অতুলনীয় সম্পদ। উল্লেখ্য, মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিকাশের ইতিহাস বেশ আকর্ষণীয় একটি বিষয়। আমরা কেমন করে আধুনিক যুগে এলাম; ধাপে ধাপে অগ্রসরের কাহিনী কিরূপ তা আমাদের অনেকেরই জানতে ইচ্ছে করে। এর মাধ্যমেই আমরা জানতে পারি কয়েক হাজার বৎর আগে সারা পৃথিবীর বেশ কয়েকটি জায়গায় মানুষ নগর তৈরি এবং সুশৃঙ্খল জীবন যাপনের চর্চা করেছিল। পাশাপাশি শৈল্পিক সক্ষমতা ও দক্ষতার নিদর্শনস্বরূপ ভাষা, সাহিত্য, দালান-কোঠা তৈরি করেছিল। প্রাচীন মানুষের এরকম কয়েকটি সভ্যতার নাম আমরা কমবেশি সকলেই জানি। যেমন- সিন্ধু সভ্যতা, গ্রীক সভ্যতা, মিশরীয় সভ্যতা, চৈনিক সভ্যতা ইত্যাদি। বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন স্থানে টেরাকোটার কাজের একটা গৌরবময় ঐতিহ্য রয়েছে। এই ধরণের বিভিন্ন ফলকের কাজ বিষ্ণুপুরের মল্ল রাজাদের তৈরি মন্দির গাত্রে লক্ষ করা যায়। এই টেরাকোটার কাজ এই অঞ্চলে অনেক প্রাচীন।প্রয়াত শিল্পী রাসবিহারী কুম্ভকার পাঁচমুড়ার মাটির ঘোড়া ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার লাভ করেছিলেন । অন্যভাবে বললে বলা যায় তিনি মাটির ঘোড়াতে প্রাণ সৃষ্টি করেছিলেন ।[7] একই সাথে এই ঘটনা হয়ে উঠেছিল এখানের শিল্পীদের অনুপ্রেরণা । এই শিল্পের প্রতি শিল্পীদের ছিল আত্মিক টান । একই সাথে এই শিল্পীদের মনে আশা জেগেছিল যে এই শিল্প থেকে জীবনের রসদ সংগ্রহ সম্ভব । এই শিল্পের সঙ্গে নারীরা অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত ।আসলে,নারীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা ছাড়া লোকশিল্প গড়ে ওঠে না আবার লোকশিল্প ছাড়া লোকসংস্কৃতির আঙ্গিনা আলোকিত হয় না ।

চাকা পূজো: লা হয় সংস্কৃতি হল টিকে থাকার কৌশল । পৃথিবীতে মানুষই কেবলমাত্র সংস্কৃতিবান প্রাণী। মানুষের এই কৌশলগুলো ভৌগোলিক, সামাজিক, জৈবিকসহ নানা বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে। পূর্বপুরুষদের যেমন এই কৌশলগুলো ছিল তা থেকে উত্তরপুরুষেরা এই কৌশলগুলো পেয়ে থাকে। অধিকন্তু সময় ও যুগের প্রেক্ষিতেও তারা কিছু কৌশল সৃষ্টি করে থাকে। তাই বলা যায় সংস্কৃতি একদিকে যেমন আরোপিত অর্থাৎ উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত তেমনি তা অর্জিতও বটে।[8] একটি দেশের বা একটি জাতির আত্মপরিচয় তার লোকসংস্কৃতি ।সাধারণ মানুষের ভাষা, জীবনবোধ, বিনোদন, সাহিত্য, পেশা – এ সব নিয়েই গড়ে ওঠে 'লোকসংস্কৃতি'। এই সংস্কৃতির মধ্যে থাকে সহজিয়া সুর এখানে কৃত্রিমতা থাকে না । প্রাচীন প্রথানুযায়ী চৈত্র সংক্রান্তির পর থেকে পুরো বৈশাখ মাস জুড়ে বন্ধ রাখা হয় কুমোর পাড়ার মাটির কাজ। এই সময় কুমোরের চাকা ঘোরে না। তৈরি করা হয় না কোন ধরণের মাটির জিনিসপত্র। দীর্ঘ এক মাস বিশ্রামের পর জ্যৈষ্ঠ মাসের কোন এক বিজোড় শনিবারে কুমোরের চাকাতে বিশেষ পুজা পাঠের মধ্য দিয়ে নতুন করে শুরু করা হয় মাটির কাজ। এই পূজো চাকা পূজো নামে পরিচিত।আসলে, লোকশিল্প ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক ।

পূজোর অতীত ইতিহাস: কেন এই সময়েই মাটির কাজ বন্ধ রাখা হয় কাজ এই বিষয়ে নান মতবাদ চালু রয়েছে। কুম্ভকার সম্প্রদায়ের একাংশের মতে, বংশ পরম্পরা গত ভাবে এই সময় কাজ বন্ধ রাখার নিয়ম চলে আসছে। তারা মনে করেন বৈশাখ মাস শিবের মাস । মনে করা হয়, যে চাকাতে কুমোররা জিনিস পত্র তৈরী করেন তা আসলে নারায়ণের চক্র। কেউ কউ মনে করেন কুম্ভকাররা নিজেদেরকে শিবের সন্তান বলে মনে করেন।যে লাঠি দিয়ে ওই চাকাটা ঘোরানো হয় তা শিবের ত্রিশূল বলে ওরা মনে করা হয়। কারণ শিবের বরপুত্র হলেন রুদ্রপাল। এই রুদ্রপালের বংশধর হলেন কুম্ভকার সম্প্রদায় তাই ওনার স্মরণে এই এক মাস কাজ বন্ধ রাখা হয়। তাই তার মনে করেনমাটি পোড়ানোর অধিকার একমাত্র রুদ্রপালের বংশধর এই কুম্ভকার সম্প্রদায়ের আছে। অন্যদিকে লোকায়ত মতে শিব ও পার্বতীর বিয়ের সময় এই কুম্ভকার সম্প্রদায় বিয়ের জন্য মাটির ঘট বা কলসী তা তৈরী করেছিলেন। সেই সূত্র ধরেই শিব সন্তুষ্ট হয়ে শিবের মানস পুত্র রুদ্রপাল কে বর দিয়েছিলেন।অন্য এদিকে লোককথা অনুযায়ী এক মুনি ও উর্বশীর ঔরসে নয় সন্তানের জন্ম হয়েছিল। এই নয় সন্তানই মর্তে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের। বছরের বিশেষ বিশেষ সময়ে এই সম্প্রদায়ের মানুষ তাঁদের আরাধ্য দেবতার পুজো করে থাকেন"। এই সময় কাজ বন্ধ রাখার বৈজ্ঞানিক কারন হিসাবে মনে করা হয় আবহাওয়া গত কারণে কাজ করতে অসুবিধা হয়। শুষ্ক আবহাওয়ার কারণে মাটির তৈরি শিল্প কর্ম অতি সহজেই ফেটে যায়। আসলে, কুমোর পাড়ায় এই রীতি দীর্ঘদিনের। একাধারে এই শিল্পের সঙ্গে মানুষরা সারা বছর নিরবিচ্ছিন্ন কাজ করার পরে ওই একটা মাস বিশ্রামের সুযোগ পান। অন্যদিকে নতুন বছরে যার সাহায্যে মূলত জীবিকা নির্বাহ হয় সেই চাকাটিকে দেবজ্ঞানে পুজো করা হয়।

পূজোর রীতি: চৈত্র সংক্রান্তির দিনে চাকার উপরে মাটি রেখে , চাকাকে মাত্র এক পাক ঘুরিয়ে , আঙ্গুল এবং কব্জির মোড় দিয়ে ঐ মাটিকে শিবলিঙ্গের আকৃতি তৈরি করা হয় ।এরপর শিবলিঙ্গের গায়ে একটি সুতোর টুকরো অর্থাৎ পৈতে এবং একখন্ড সাদা বস্ত্র শিবলিঙ্গের নীচের দিকে দেওয়া হয়।এই অবস্থায় পুরো বৈশাখ মাস রেখে দেওয়া হয়।পরে জ্যৈষ্ঠ মাসের এক বিজোড় শনিবার সেই শিব লিঙ্গের আকৃতি বিশিষ্ট মাটিকে সুন্দর করে সাজানোর পর কুলপুরোহিত ডেকে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে পুজো করা হয়।[9] এছাড়া মনসা পূজা, আম্বুবাচী, দশহরা, নাগপ্নচমী, দুর্গা অষ্টমীতেও চাকার কাজ বন্ধ রাখা হয় ।এছাড়া কালী পূজা,

বিশ্বকর্মা পূজাতেও চাকার কাজ বন্ধ থাকে ।[10] শিবলিঙ্গ তৈরীর শেষে কলাই সিদ্ধ ও মুড়ি খাওয়ার রেওয়াজ আছে । পরের দিন শিবলিঙ্গের মাথায় ধান - দূর্বা এবং আবির দিয়ে প্রনাম করা হয় । এরপর চাকার চারিদিকে সুন্দর ভাবে আলপনা ও ফুল দিয়ে সাজিয়ে জৈষ্ঠ্য মাসের বিজোড় শনিবার ধরে আম্রপল্লব সাজিয়ে , ঘট পেতে ধূপ-দীপ দিয়ে চাকা টিকে শিব জ্ঞানে পুজো করা হয় । প্রসাদ স্বরূপ খই, মুড়ি , চিড়েভাজা , মুড়কি ,বাদাম , কলাই , বিভিন্ন ফল ,বাতাসা থাকে ।এদিনে পুজো অর্চনার এবং পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার জন্য হয় । বাড়িতে ব্রাহ্মন, বৈষ্ণব ,কুটুম্ব ভোজনের ব্যবস্থা করা হয় ।এরপর এইদিন বিকেলে শিবলিঙ্গকে নিয়ে গিয়ে স্থানীয় পুকুরে বিসর্জন দেওয়া হয় । বিসর্জন দেওয়ার পর সব কুম্ভকারেরা মাটির খাদানে গিয়ে শিবঠাকুরকে স্মরন করে মাটি হাত করে এবং সামান্য পরিমান মাটি কেটে নিয়ে আসে। এইভাবে তারপরের দিন থেকে নতুন কাজের শুভারম্ভ হয় ।[11]

পাঁচমুড়ার শিল্প কর্মের মৌলিকত্ব: বিশ্বায়নের প্রভাবে গোটা বিশ্ব জুড়ে এই শিল্প বিভিন্ন সংকটের মুখে পড়েছে ।কুম্ভকার সম্প্রদায়ের অনেক মানুষ তাদের চিরাচরিত পেশা ত্যাগ করে অন্য কোন কর্মকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করছে । তবে পাঁচমুড়া, সেন্দরা, সোনামুখী রাজগ্রাম ইত্যদি স্থানের কুম্ভকারদের অবস্থা অনেকটাই আলাদা। বিশেষ করে পাঁচমুড়ার শিল্পীদের কথা বলতে হয়। এরা এই শিল্পকে, হাঁড়ি-কলসির মধ্যে আবদ্ধ না রেখে চিরাচরিত ঐতিহ্যকে যুগপোযুগি করে তুলেছেন।তাঁরা সময়ের সাথে সাথে শিল্পী মনন এবং শিল্পে বস্তুগত পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। ভাস্কর্যের নানান আঙ্গিক ফুটে উঠেছে তাঁদের শিল্পকর্মে ।এছাড়াও বেশ কিছু শিল্পকর্মের অন্তর্গঠনে পাশ্চাত্য শিল্প কলার প্রভাবও লক্ষ্য করজা যায় । তবে তার নিজস্ব সত্ত্বা অটুট রয়েছে । স্বকীয় দক্ষতায় এঁদের শিল্পকর্মগুলি যেন ভেতরের থেকে স্বতোৎসারিত। অতীতের পাঁচমুড়ার টেরাকোটার কাজের সঙ্গে আজকের কাজের বহু তফাৎ।শিল্প কর্মগুলির নানান আঙ্গিকের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে কাজের ক্ষেত্র অনেক বিস্তৃতি লাভ করেছে। কিন্তু চাকা পূজার কোনোরূপ পরিবর্তন তাঁরা করেননি। তার তাদের দীর্ঘদিনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে আনন্দের সঙ্গে বহন করে চলেছেন ।এরা এই কাজ করতে পারার কারণ অনুসন্ধান করতে হলে আমাদের অনেক গভীরে যেতে হবে ।'শিক্ষা আনে''-চেতনা''- এই চেতনা তাদের শিল্প কর্মকে প্রভাবিত করেছে । আসলে, পাঁচমুড়ার কুম্ভকার সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার প্রসার । এই শিক্ষিত মানুষেরা এনেকেই ভালোবেসে এই শিল্পকর্ম করেন । অনেক শিক্ষক মহাশয় তাদের অবসর সময় এই শিল্প কর্মে ব্যায় করেন ।এই শিল্প কর্মের উন্নতির কথা ভাবেন। তাদের শিল্প মনের বহিঃপ্রকাশ ঘটে তাদের শিল্প কর্মে ।

মূল্যায়ণ: সংস্কৃতি জাতির জীবনধারা। কোন এলাকার মানুষের আচার-ব্যবহার, জীবিকার উপায়, সঙ্গীত, নৃত্য, সাহিত্য, নাট্যশালা, সামাজিক সম্পর্ক, ধর্মীয় রীতি-নীতি, শিক্ষা-দীক্ষা ইত্যাদির অভিব্যক্তি।[12] এই বিষয়গুলোকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায়। কিছু কিছু নিত্যদিনকার জীবনযাপনের সাথে সরাসরি ভাবে সম্পর্কযুক্ত । আবার কিছু জীবন উপভোগের ব্যবস্থা এবং উপকরণের সাথে জড়িত। অন্য ভাবে বললে বলা যায় সংস্কৃতি হোল বেঁচে থাকার কৌশল । এই কৌশল উত্তরপুরুষেরা তাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পেয়ে থাকে। আবার সময় ও যুগের প্রেক্ষিতেও উত্তরপুরুষেরা কিছু কৌশল সৃষ্টি করে । তাই সংস্কৃতি একদিকে যেমন আরোপিত অর্থাৎ উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত আন্যদিকে তেমনি অর্জিত ।সঙ্গত কারণেই চাকা পূজা হয়ে উঠেছে পাঁচমুড়ার কুম্ভকারদেরর প্রধান উৎসব । এই পূজোকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে সামাজিক রীতি নীতি আচার আচরণ । এর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে ধর্মচিন্তা, জ্ঞান, বিশ্বাস, নৈতিকতা ও শিল্প চিন্তা । উল্লেখ্য, প্রত্যেকটি দেশের নিজস্ব শিল্প ও সংস্কৃতি রয়েছে।আবার, একেকটি শিল্পের

বিস্তারের পেছনে থাকে দেশ বা জাতির অবদান।মৃৎশিল্প বাঁকুড়া জেলার অন্যতম লোকশিল্প। এই জেলার সংস্কৃতির সঙ্গে মৃৎশিল্পের সম্পর্ক অনেক । তাই এই শিল্পকে রক্ষা করা দরকার । দরকার সরকারি ও বে সরকারি সহযোগিতা ।একই সাথে দরকার বিপণনের সহজ ব্যবস্থা ।

---

[1] রহমান, মুহাম্মদ হাবিবুর (১৯৯৭), *একুশে ফেব্রুয়ারি সকল ভাষার কথা কয়,* বাংলাদেসশঃ সময় প্রকাশন, পৃষ্ঠা.২৬ ।

[2] চৌধুরী শ্রীরথীন্দ্রমোহন (২০০০),*বাঁকুড়া জনের ইতিহাস-সংস্কৃতি*, কলকাতা, পৃ.১২৮ ।

[3] জানা অচিন্ত কুমার (১৯৯৪),*বাঁকুড়ার অর্থনীতিতে লোক শিল্প,* প্রথম খণ্ড, বাঁকুড়া ।

[4] মিত্র আশোক, সম্পাদিত(১৯৬১),*পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা* ,তৃতীয় খণ্ড, সেন্সাস অফ ইণ্ডিয়া, দিল্লী ।

[5] Shrma R.S (Reprinted 2015), *India`s Past*, Oxford,p.58 .

[6] *Ibid,* p. 84.

[7] জানা অচিন্ত কুমার ,পূর্বুক্ত,পৃ.১৭ ।

[8] খান এ কে এম শওকত আলী (২০১৪)। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস, ঢাকাঃ গ্রন্থ কুটির, পৃষ্ঠা ৪৭ ।

[9] সাক্ষাৎকার, জয়দেব কুম্ভকার, পাঁচমুড়া, বাঁকুড়া (২৪/০৫/২০২১) ।

[10] এ কে এম শওকত আলী (২০১৪), *op.cit,* p.23

[11] সাক্ষাৎকার , রুমা কুম্ভাকার,পাঁচমুড়া, বাঁকুড়া (২৬/০৬/২০২১)

[12] উমর বদরুদ্দীন (১৯৮৪), *সংস্কৃতির সংকট,* ঢাকা: মুক্তধারা প্রকাশনী, পৃ. ২৭ ।